বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমাজ, ব্যক্তি ও ধর্ম: একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

সারাংশ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়কালে যা প্রায়ই বাংলার 'নবযুগ' বলে পরিচিত হয়ে এসেছে। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকাতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনায় তাঁর দার্শনিক ভাবধারা পরিস্ফুট হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সমস্ত রচনার মধ্যে দর্শনের ছোঁয়া থাকলেও তাঁর মূল দার্শনিক রচনাগুলি হল 'হিন্দুধর্ম', *ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, কমলাকান্তের দপ্তর, সাম্য* ইত্যাদি। এই রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমের সম্পূর্ণ দর্শন চিন্তার একটি আভাস পাওয়া যায়। এছাড়াও তাঁর রচিত *আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকান্তের উইল* প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যেও তাঁর দর্শন চিন্তার বীজ নিহিত আছে।

আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও উপন্যাসের মধ্যে ব্যক্তি, সমাজ ও তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক এবং ধর্ম সম্পর্কে যে আলোচনা রয়েছে তার মূল্যায়ন করা। *ধর্ম্মতত্ত্ব* গ্রন্থে অনুশীলনতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শ মানুষের কথা বলেছেন, *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থে সেই আদর্শ মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর এই আদর্শ মানুষের ধারণা ও অনুশীলনতত্ত্ব তাঁর সমগ্র দার্শনিক চিন্তার ভিত্তিমূল বললে অত্যুক্তি হয় না। তাই, তাঁর দার্শনিক ভাবধারার সবিচার আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা মানুষ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

বঙ্কিমের মতে মানুষের সার্বিক উন্নতি ও ধর্ম পালন সমাজ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, সেহেতু আমরা প্রথমেই তাঁর সমাজচিন্তা নিয়ে আলোচনা করব। এই গবেষণা সন্দর্ভের দ্বিতীয়

অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল বঙ্কিমের সমাজচিন্তা। বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক রচনার মধ্যে সমাজচিন্তার বীজ লক্ষ করা যায়। তবে, তাঁর সমাজচিন্তা বিষয়ক আলোচনা মূলত তাঁর বিভিন্ন সামাজিক রচনা, যেমন—*কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ* ইত্যাদি এবং *সাম্য,* 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'বিড়াল' ইত্যাদি প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে প্রীতি বৃত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি স্বদেশ প্রীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অনেকেই মনে করেন যে, ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়েছে বঙ্কিমের হাত ধরে। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, জাতীয়তাবাদী ভাবধারা যতটা স্পষ্টভাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেছিলেন, সেই সময়কালে অন্য কেউই ততটা স্পষ্ট করে তা ব্যক্ত করতে পারেনি। বঙ্কিমকল্পিত জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হল 'হিন্দুধর্ম'।

কোনও কোনও স্থলে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, ব্যক্তির উন্নতির আগে সমাজের উন্নতি হওয়া আবশ্যক। তবুও তিনি কখনও ব্যক্তির উন্নতিকে খাটো করে দেখেননি। ব্যক্তি বা মানুষ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনাকে আমরা দুটি দিক থেকে আলোচনা করতে পারি। প্রথম, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিশ্লেষণের মাধ্যমে–যেখানে আমরা সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের স্বরূপ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনা তুলে ধরব এবং দ্বিতীয়ত, আদর্শ মানুষের স্বরূপ বিষয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা আলোচনা করব।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের মূল বিষয় হল কীভাবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়ওা যায়। তাঁর মতে অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী তখনই হতে পারবে যখন তাঁর সামনে কোনও আদর্শ পুরুষ থাকবে। *ধর্ম্মতত্ত্বে* তিনি বলেছেন একথা সত্যি যে মনুষ্যের মধ্যে এমন আদর্শ মানুষ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে তিনি

হিন্দুশাস্ত্র থেকে একাধিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। আদর্শ মানবের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি কখনও রামের কথা বলেছেন আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণের কথা বলেছেন।

'ধর্ম' শব্দটি যেমন নৈতিকতাকে বোঝায় তেমনি রিলিজিয়নকেও বোঝায়। অনেকে মনে করেন যে, নৈতিকতা হল রিলিজিয়নের একটি ভিত্তি। অর্থাৎ রিলিজিয়নের মধ্যে দিয়েই নৈতিকতা প্রকাশ পায়। তাই, বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্ম'-এর ধারণাটি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধর্ম অর্থে 'নৈতিকতা' ও 'রিলিজিয়ন' বলতে কী বোঝায় এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক কী তা অবশ্য বিচার্য বিষয়।

কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনও ব্যক্তির কোন কাজ করণীয় তা নির্ধারিত হয় নৈতিকতার দ্বারা। বঙ্কিমের নৈতিকতা বিষয়ক চিন্তাভাবনার মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। একদিকে তিনি বলেছেন যে, সেই কাজই নৈতিক যে কাজ ঈশ্বরকে উদ্দেশ্য করা হয়, আবার অন্যদিকে তিনি উপযোগিতার নীতিকে নৈতিকতার মানদণ্ড বলেও উল্লেখ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিমের ওপর হিতবাদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি যেক্ষেত্রে 'ধর্ম' বলতে 'নৈতিকতা'-কে বুঝিয়েছেন সেক্ষেত্রে তিনি 'উপযোগিতার নীতি'র গুরুত্বের কথাও বলেছেন। অথচ, তিনি জীবনের শেষ বেলায় উপযোগবাদের সমালোচনাও করেছেন। যদিও, 'উপযোগিতার নীতি'-কে কখনও অধর্ম বলে উল্লেখ করেননি। স্বভাবতই এই আপাতদৃষ্ট স্ববিরোধিতা তাঁর 'ধর্ম' বিষয়ে চিন্তাভাবনার ফসল বলে মনে হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, কীভাবে বঙ্কিমচন্দ্র উপযোগবাদকে অস্বীকার করেও উপযোগিতার নীতিকে স্বীকার করলেন?

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নতুন চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল সেই চিন্তাভাবনার পুরোধারূপে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু তার একটা সম্যক মুল্যায়নের প্রয়োজন

অনুভূত হয়। ভারতীয় ধর্মনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বিচার ও মুল্যায়ন করাই এই বর্তমান গবেষণার গুরুত্ব। কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক ভাবনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'ধর্ম' ও 'নৈতিকতা'-কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। তাই, তাঁর দর্শনের সামগ্রিক মুল্যায়ন হয়তো ভারতীয় ধর্মনীতির আলোচনাকে এক নতুন পথ দেখাতে পারে।